(২৫ মে ১৮৯৯-২৯ আগষ্ট ১৯৭৬)

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

মধ্যযুগের কবি চণ্ডীদাসের পর মানবিকতার উত্তাসনের মহান ব্রত নিয়ে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। স্বদেশ ও স্বকালের সীমা অতিক্রম করে আপন প্রাজ্ঞতায় ও সৃষ্টিশীলতায় তিনি এক দিকে যেমন যুগন্ধর ও যুগোত্তীর্ণ, অন্যদিকে তেমনি জন্মভূমির সীমা অতিক্রম করে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত। রবীন্দ্রনাথের পর, বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্ট সাধনে যারা অগ্রগামী, কাজী নজরুল ইসলাম তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে গণ্য।

উনিশ শতকের সমাপ্তি লগ্নে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত সময়ে, পশ্চিম বঙ্গের বর্ধমান জেলার, আসানশোল মহকুমার, চুরুলিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেন এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ (১১ জৈষ্ঠ্য ১৩০৬-১২ ভাদ্র, ১৩৮৩)। পিতা কাজী ফকির আহমদ ও মাতা জাহেদা খাতুনের ষষ্ঠ সন্তান নজরুল। আবাল্যে দারিদ্র্যের সংগে সংগ্রাম করে দুখু মিয়া নামেই বেড়ে উঠেন। শৈশব অতিক্রম হবার পূর্বেই জীবিকার তাগিদে যোগ দেন লেটো গানের দলে এবং সেখান থেকেই তাঁর সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত। তাঁর নাতিদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে রচিত উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধের সংখ্যা সীমিত হলেও কাব্য রচনা করেছেন অজস্র এবং তাঁর রচিত সংগীতের সংখ্যা প্রায় ৪০০০। সাহিত্যিক পরিচয় ছাড়াও তিনি ছিলেন সৈনিক, রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, সম্পাদক, অভিনেতা এবং সংগীতজ্ঞ। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য কারাবরণও করেছেন বছরকাল। বৃটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগে বাজেয়াপ্ত হয় ৫টি গ্রন্থ। পরিচিতি পান বিদ্রোহী কবি নামে। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন জগত্তারিণী স্বর্ণপদক (১৯৪৫), পদ্মভূষণ পদক (১৯৬০), ডি. লিট ডিগ্রি (১৯৭৪) এবং ২১-শে পদক (১৯৭৬)। পেয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব (১৯৭৬) এবং অর্জণ করেছেন রণ সংগীত রচয়িতার গৌরব।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল রোমান্টিক কবি রূপেই সুপরিচিত। তাঁর এই রোমান্টিকতা প্রেম ও বিদ্রোহের দ্বৈত সত্তার নামান্তর। 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য' নিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে আলোড়িত করেছিলেন আবির্ভাব কালেই। তাঁর প্রেম একদিকে যেমন মানবী প্রিয়া থেকে বিশ্বলোকে ধাবিত হয়েছে; অন্যদিকে তেমনি তা বাস্তবতার জগৎ থেকে লীন হয়ে গেছে অধ্যাত্ম চেতনার মহাসাগরে। আবার সামাজিক অসংগতি, অন্যায়, অসত্য, অকল্যাণের বিরুদ্ধে, দেশমাতার মুক্তির জন্য তাঁর সোচ্চার বিদ্রোহের সূত্রপাত মূলত নিজের আত্মশুঙ্খলিত 'আমিত্বকে' মুক্তিদানের ব্রতেই নিহিত—

আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য,
.....
আমি চির বিদ্রোহী বীর-
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

আত্ম থেকে অপরে প্রসারিত তাঁর এই বিদ্রোহী সত্তা কেবল ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই নয়, মহান মুক্তিযুদ্ধে পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালিকেও উজ্জীবিত করেছে প্রবলভাবে।

কবি নজরুলের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি মানবতার কবি। শুধু কাব্যে নয়, তাঁর সমগ্র সাহিত্যে তিনি মানুষের জয় ঘোষণা করেছেন দৃপ্ত কণ্ঠে। সমাজের সব স্তর থেকে বিভেদ ঘুচিয়ে তিনি মানুষকেই সবার উপরে তুলে ধরেছেন। সাহিত্য চর্চার সূচনা লগ্ন থেকেই তিনি হিন্দু-মুসলিম অভিন্ন বাঙালি সত্তাকে লালন করেছেন আপন সৃষ্টিকর্মে। ঔপনিবেশিক শোষণের তীব্রতার সময়ে যখন অসহযোগ-খেলাফত আন্দোলনকে ম্লান করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল, তখন বাঙালিকে একাত্মা করতে নজরুল উচ্চারণ করেছেন মানবতার অব্যর্থ বাণী—

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র ।

মানুষের উচু-নীচু, জাত-পাত বিচারের ক্ষুদ্রতাকে তিনি কঠোর ভাষায় বিদ্রুপ করেছেন। কেননা মানুষকে বিভক্ত করার এই নীচতা মানবিকতাকেই ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে। তাই তার কঠোর উচ্চারণী—

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছে জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া ॥

শুধু জাতিভেদ নয়, সাহিত্যে তিনিই প্রথম নারী-পুরুষের সম-অধিকারকে সুনিশ্চিত করে একদিকে যেমন জেন্ডার চেতনার অগ্রপথিক হয়ে আছেন, অন্যদিকে তেমনি কৃষক-কুলি-মজুরসহ সমাজের অবহেলিত মানুষের শ্রেণিচেতনাকে চিহ্নিত করে বিশ্ব সৃষ্টি এবং সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে তাদের অবস্থানকে সুনিশ্চিত করেছেন—

এই ধরণীর যাহা সম্বল
বাসে ভরা ফুল, রসে-ভরা ফল
সু-স্নিগ্ধ মাটি, সুধাসম জল, পাখির কণ্ঠে গান-
সকলের এতে সম অধিকার, এই তাঁর 'ফরমান' ॥

একবিংশ শতাব্দীর চরম উৎকর্ষের এই দিনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপ-ব্যবহারে যখন মানবিকতা ভূলুণ্ঠিত হয় অবলীলায়, তখন নজরুল আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে আমাদের জীবন ও সাহিত্যে। মাত্র দুই দশকের সাহিত্য চর্চায় নজরুল সমকাল থেকে দূরবর্তী ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন মহৎ স্রষ্টার ন্যায়। বর্তমান সময়ে, যুব সমাজের অবক্ষয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে, ধর্মকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের ভয়ার্ত পরিবেশে, জাতির বিবেকের মতই ধর্ম প্রবর্তকের কাছে নজরুল ক্ষমা চেয়েছেন, ধর্মকে বিকৃত ব্যাখ্যায় উপস্থাপনের অপরাধে—

তোমার বাণীরে করিনি গ্রহণ, ক্ষমা কর হযরত ॥
ভুলিয়া গিয়াছি তব আদর্শ তোমার দেখানো পথ।
তুমি চাহ নাই ধর্মের নামে গ্লানিকর হানাহানি,
তলওয়ার তুমি দাও নাই হাতে, দিয়াছ অমর বাণী,
মোরা ভুলে গিয়ে তব উদারতা
সার করিয়াছি ধর্মান্ধতা,
বেহেশ্‌ত হতে ঝরে নাকো আর তাই তব রহমত ॥

কবি নজরুলের ব্যক্তি জীবন দীর্ঘ হলেও সাহিত্যিক জীবন ছিল স্বল্পকালীন। ১৯৪২ এর শেষে তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাক্‌শক্তি ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় এদেশে নিয়ে আসেন। এখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ প্রাঙ্গনে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। নজরুলের কাব্যিক সত্তা বাঙ্গালিকে উজ্জীবিত করে যে কোনো ব্যক্তিক ও সামাজিক সংকটে। তাই শুধু জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকীতে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষণে নজরুল বাঙ্গালি হৃদয়ে স্মরিত হয় বিনম্র শ্রদ্ধায়, গভীর ভালোবাসায়।

দ্রোহের কবি, সাম্যের কবি, মানবতার কবি, প্রেমের কবি, অসাম্প্রদায়িক চেতনার কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮ তম জন্মদিনে আমরা ঢাকা কলেজ পরিবার তাঁর প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা।

রচনায় : বাংলা বিভাগ
ঢাকা কলেজ

প্রফেসর মো: মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহ্
অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ